أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/٢٤)-٢٢٦

www.motaher21.net

هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ

এগুলো কিতাবের মূল;

These are the foundation of the Book:

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-৭-৯

هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ- فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۘ وَ مَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ

তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছেঃ এক হচ্ছে, মুহকামাত, যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, মুতাশাবিহাত। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলেঃ “আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে” । আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত- ৮

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

‘হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। ’

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি সমুদয় মানুষকে একদিন সমবেত করবে, যাতে কোনও সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অঙ্গীকারের খেলাফ করেন না।

৭-৯ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই ওগুলোর ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলো আয়াত এরূপও রয়েছে যেগুলোর ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলোকে প্রথম প্রকারের আয়াত সমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলোকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলোকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকে, যেগুলো তাদের জ্ঞানের ঊর্ধে এবং ওগুলোর মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে। (আরবী) অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলো আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ।

‘তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ো না, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর,ঐগুলোকেই মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ কর। কতগুলো আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলোর একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াত সমূহের মতই কিন্তু ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ো না।' পূর্ববর্তী মনীষীগণ হতে (আরবী) ও (আরবী) শব্দদ্বয়ের বহু অর্থ নকল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, (আরবী) হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলো, যেগুলোর মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ এবং আমল সমূহের বর্ণনা থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, (আরবী) (৬:১৫১) এবং এর পরবর্তী হুকুমের আয়াতগুলো হচ্ছে মুহকামাত এবং (আরবী) (১৭:২৩) ও এর পরবর্তী তিনটি আয়াত মুহকামাত। হযরত আবু ফাকতাহ (রঃ) বলেন যে, এগুলো সূরাসমূহের সূচনা। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার (রঃ) বলেন যে, এগুলো হচ্ছে ফরযসমূহ, নির্দেশাবলী, বাধা-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের আয়াতসমূহ। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, ‘এ

আয়াতগুলোকে কিতাবের মূল বলার কারণ এই যে, এগুলো সমগ্র কিতাবের মধ্যে রয়েছে। হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সমস্ত মাযহাবের লোক এগুলোকে স্বীকার করে বলে এগুলোকে কিতাবের মূল বলা হয়। (আরবী) ঐ আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো রহিত হয়ে গেছে। যেগুলোর পূর্বের ও পরের, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্তসমূহ এবং যেগুলো দ্বারা শপথ করা হয়েছে।

ঐগুলোর উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। আমল করার জন্যে ঐগুলো আহকাম নয়। হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই। হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, ঐগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের প্রথমে লিখিত (আরবী) হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, (আরবী) আয়াতগুলো একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে। (আরবী) (৩৯:২৩) এবং এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এটা এমন এক বাক্য যা একই রচনা রীতির অধীনস্থ হয়। আর (আরবী) ওকেই বলা হয় যেখানে দুটি বিপরীতমুখী জিনিসের উল্লেখ থাকে। যেমন জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষণ বর্ণনা এবং পাপ-পুণ্যের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। এ আয়াতে (আরবী) শব্দটি (আরবী) শব্দের বিপরীত শব্দরূপে এসেছে। এ জন্যেই আমরা যে ভাবার্থ বর্ণনা করেছি ওটাই সঠিক। এটাই হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াসারেরও (রঃ) উক্তি। তিনি বলেন যে, এগুলো হচ্ছে প্রভুর দলীল স্বরূপ। ঐগুলোর মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলোর প্রকৃত ভাবার্থ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (আরবী) আয়াতগুলোর সত্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। ঐ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। ঐ আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলোকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্বীয় জঘন্য উদ্দেশ্যাবলী পুরো করতে চায় এবং শাব্দিক অনৈক্য হতে অবৈধ। উপকার গ্রহণ করতঃ নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াত সমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পুরো হয় না। কেননা, ঐগুলোর শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলো সরাতেও পারে না এবং ওগুলোর মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয় না। এ জন্যেই ঘোষণা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি উৎপাদন, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তারা নিজেদের বিদআতের দলীল কুরআন পাক থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদআতকে খণ্ডন করে থাকে। যেমন খ্রীষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের (আরবী) শব্দকে দলীল রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলোকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ সে ঈসা (আঃ) একজন দাস ছাড়া কিছুই নয়, তাকে আমি পুরস্কৃত করেছি।' (৪৩:৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর মতই, তাকে (আদম আঃ) তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন- 'হও' তেমনই হয়ে গেছে।' (৩:৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এসবকে ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খ্রীষ্টানেরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁর বান্দা ও রাসূল। "

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলোকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলো নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। এ আয়াতে ঐগুলোকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।' এ হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ বুখারী শরীফেও এ হাদীসটি কিতাবুল কাদরের মধ্যে এ আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, এগুলো খারেজী ছিল। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটিকে মাওকুফ' মনে করা হলেও এর বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথম বিদআত তারাই ছড়িয়েছিল। এ দলটি শুধুমাত্র ইহলৌকিক দুঃখের কারণে মুসলমানগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হুনাইন যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন তখন ঐ লোকগুলো ঐ বন্টনকে অন্যায় মনে করেছিল। তাদের মধ্য হতে যুল খুয়াইসির নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে পরিষ্কারভাবে বলেই দেয়ঃ ন্যায়নীতি অবলম্বন করুন। এ বন্টনে আপনি সুবিচার প্রদর্শন করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তো আমাকে বিশ্বস্ত রূপে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমিই যদি সুবিচার না করি তবে তো তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সে ফিরে গেলে হযরত উমার (রাঃ) আবেদন করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাকে হত্যা করে ফেলি, আপনি আমাকে এ অনুমতি প্রদান করুন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘ছেড়ে দাও, তার বংশ হতে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যে, তোমরা তোমাদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় এবং তোমাদের কুরআন পাঠকে তাদের কুরআন পাঠের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার হতে বেরিয়ে যায়। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্যে বড় পুণ্য রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তাদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদেরকে নাহরাওয়ানে হত্যা করেন। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদী দলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের মধ্যে তারা নতুন বিদআত চালু করে এবং আল্লাহর পথ হতে বহু দূরে সরে পড়ে। তাদের পরে কাদরিয়্যাহ দলের আবির্ভাব হয়। তার পরে বের হয় মুতাযিলা সম্প্রদায়। তার পরে জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি দলের উদ্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তিনি বলেনঃ “আমার উম্মতের মধ্যে অতিসত্বরই তেহাত্তরটি দলের আবির্ভাব ঘটবে। একটি দল ছাড়া সবই জাহান্নামী হবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ঐটি কোন্ দল? তিনি বলেনঃ ‘তারা ওরাই যারা এমন জিনিসের উপর রয়েছে যার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবীগণ (রাঃ) রয়েছে।' (মুসতাদরিক-ইহাকিম) আবূ ই'য়ালার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন মাজীদ তো পাঠ করবে, কিন্তু ওটা এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবে যেমন কেউ খেজুরের আঁটি খুঁড়ে ফেলে। ওর ভুল অর্থ বর্ণনা করবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। (আরবী) শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিতগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, অন্য কেউ জানে না। এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি। মু'জাম-ই-কাবীর গ্রন্থে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের উপর আমার শুধু তিনটি , জিনিসের ভয় রয়েছে। (১) প্রথম ভয় মালের আধিক্যে। কেননা, এরই কারণে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে এবং পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। (২) দ্বিতীয় ভয় এই যে, তারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যার পিছনে লেগে পড়বে, অথচ ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে ওর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। (৩) তৃতীয় ভয় এই যে, তারা বিদ্যা অর্জন করে তা নষ্ট করে দেবে এবং কোনই গ্রাহ্য করবে না।' এ হাদীসটি সম্পূর্ণ গারীব। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কুরআন কারীম এ জন্যে অবতীর্ণ হয়নি যে, একটি আয়াত অন্য আয়াতের বিপরীত হবে। যা তোমরা বুঝতে পার তার উপর আমল কর এবং যা অস্পষ্ট তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এবং হযরত মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকেরাও এর প্রকৃত অর্থ অবগত হন না। তবে তাঁরা ওর উপর বিশ্বাস রাখেন। হযরত ইবেন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এর জটিল ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা ঐ কথাই বলেন যে, ওগুলোর উপর তাদের ঈমান রয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা' বও (রাঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। এ উক্তিগুলো হচ্ছে ঐ দলের যারা (আরবী) শব্দের উপর বিরতি আনয়ন করতঃ পরবর্তী বাক্যকে এর থেকে পৃথক করে থাকেন। অন্য একটি দল (আরবী) শব্দের উপর বিরতি না এনে শব্দের উপর বিরতি এনে থাকেন (ওয়াকফ করে থাকেন)।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রের মূলনীতির উপর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তিগণও একথাই বলেন। তাঁদের বড় দলীল এই যে, যে কথা বোধগম্য নয় তা বলা ঠিক নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেনঃ 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণও অস্পষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা জানেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেনঃ 'প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন এবং যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তাঁরা বলেনঃ "আমরা ঐগুলোর উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর তাঁরা স্পষ্ট আয়াতের দ্বারা অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফলে কারও মুখ খোলার প্রশ্নই উঠে না। অথচ কুরআন কারীমের বিষয়বস্তুও যথার্থ হয়ে যায়, দলীল চালু হয়, অন্যায় পরিত্যক্ত হয় এবং কুফর বিদূরতি হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন। কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, (আরবী) শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু' টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ হে পিতঃ! এটাই আমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা। (১২:১০০) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ তারা শুধু ওর যথার্থতারই অপেক্ষা করছে, যেদিন ওর যথার্থতা এসে যাবে। (৭:৫৩) সুতরাং এ দু' জায়গায় (আরবী) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূলতত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের। শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তবে শব্দের উপর ওয়াফ করা জরুরী। কেননা, কোন কার্যের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (আরবী) উদ্দেশ্য হবে এবং (আরবী) বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। (আরবী) শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে (আরবী) অর্থাৎ, আমাদেরকে ওর (আরবী) বা ব্যাখ্যা বলুন।' (১২:৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে (আরবী) শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তবে (আরবী) শব্দের উপর ওয়াকফ করা উচিত। কেননা, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাঁদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূলতত্ত্বের জ্ঞান তাদের নেই। এরূপ (আরবী) হলে শব্দটি (আরবী) হবে। আবার (আরবী) ছাড়াই (আরবী) হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে (আরবী) হতে (আরবী) (৫৯:৮-১০)

পর্যন্ত অন্য স্থানে রয়েছেঃ (আরবী) (৮৯:২২) অর্থাৎ (আরবী) এ রকম ছিল। জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান-'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি' এর অর্থ এই যে, তারা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলোই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলোই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ

তা'আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলোর মধ্যে বৈপরীত্ব কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো তবে অবশ্যই তারা এর মধ্যে বহু মতভেদ পেতো।' (৪:৮২) এ জন্যেই এখানেও বলেছেন- এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী কে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ যার শপথ সত্য, যে স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট, যার কথা সত্য, যার অন্তর পরিশুদ্ধ, যার পেট হারাম থেকে রক্ষিত এবং যার লজ্জাস্থান ব্যভিচার হতে মুক্ত সেই পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতক লোককে দেখেন যে, তারা কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহকে পরস্পর বিরোধী বলতো। অথচ তাঁর কিতাবের প্রতিটি আয়াত অন্য আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করে একটিকে অন্যটির বিপরীত বলো না। যা জান তা বল এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফর। (এ কথা তিনবার বলেন) যা জান তার উপর আমল কর এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর।' (আবু ইয়া' লা) হযরত নাফে' ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বলেন, 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারাই যারা বিনয়ী, যারা নম্রতা প্রকাশ করেন, প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা করেন, বড়দেরকে বশীভূত করেন না এবং ছোটদেরকে ঘৃণা করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, "হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেন না যারা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করতেনঃ (আরবী) অর্থাৎ 'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। অতঃপর তিনি। (আরবী)-এ আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) না প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ (আরবী) অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে অন্তর সমূহের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর স্থির রাখুন। হযরত আসমা (রাঃ) একদা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'অন্তরের কি পরিবর্তন হয়ে থাকে? তিনি বলেনঃ হ্যা, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গুলি সমূহের দুই অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে ঠিক রাখেন এবং ইচ্ছে

করলে বক্র করে দেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তাআলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।' অন্য বর্ণনায় এও রয়েছে, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নিজের জন্যে করতে থাকবো। তিনি বলেনঃ "এই প্রার্থনা করঃ (আরবী) অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রভু! আমার পাপ মার্জনা। করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ, দুঃখ কাঠিন্য দূর করুন এবং আমাকে পথভ্রষ্টকারী ফিতনা হতে বাঁচিয়ে নিন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর। (আরবী) -এ প্রার্থনাটি শুনে হযরত আসমা (রাঃ)-এর মত তিনিও প্রশ্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ উত্তরই দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। এ হাদীসটি গারীব। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে, তবে কুরআন কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করার উল্লেখ নেই। সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে জাগরিত হতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেনঃ (আরবী) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট আমার পাপের ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট করুণা যাঞা করছি। হে আল্লাহ! আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দিন এবং সুপথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে বক্র করবেন না ও আপনার নিকট হতে আমাকে রহমত দান করুন, আপনি সুপ্রচুর দানকারী'। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মাগরিবের নামায পড়ান। প্রথম দু'রাক'আতে আলহামদু শরীফের পর তিনি মুফাসসালের ছোট দু'টি সূরা পাঠ করেন এবং তৃতীয় রাকআতে আলহামদু শরীফের পর এ আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত আবু আবদুল্লাহ (রঃ) বলেন, "আমি সে সময় তার নিকটেই চলে গিয়েছিলাম, এমন কি আমার কাপড় তার কাপড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং আমি স্বয়ং তাঁকে এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি। (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাক) হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এ হাদীসটি শুনার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে (আরবী) পাঠ করতেন। কিন্তু এ হাদীসটি শ্রবণের পর তিনিও এ রাকআতে এ আয়াতটি পড়তে আরম্ভ করেন এবং কখনও পরিত্যাগ করেননি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও ফায়সালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কার্যের বিনিময় প্রদানকারী। ঐদিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহুবচন 'মুহকামাত' । 'মুহকামাত আয়াত' বলতে এমন সব আয়াত বুঝায় যেগুলোর ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, যেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয়-সন্দেহে অবকাশ থাকে না, যে শব্দগুলো দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং যেগুলোর অর্থ বিকৃত করার সুযোগ লাভ করা বড়ই কঠিন। এ আয়াতগুলো 'কিতাবের আসল বুনিয়াদ' । অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে এ আয়াতগুলো সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোতেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্রষ্টতার গলদ তুলে ধরে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। দ্বীনের মূলনীতি এবং আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, চরিত্রনীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধের বিধান এ আয়াতগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি কোন্ পথে চলবে এবং কোন্ পথে চলবে না একথা জানার জন্য যখন কুরআনের শরণাপন্ন হয় তখন মুহকাম আয়াতগুলোই তার পথপ্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবে এগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয় এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

‘মুতাশাবিহাত’ অর্থ যেসব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহ-সংশয়ের ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে। বিশ্ব-জাহানের অন্তর্নিহিত সত্য ও তাৎপর্য, তার সূচনা ও পরিণতি, সেখানে মানুষের অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত সর্বনিম্ন অপরিহার্য তথ্যাবলী মানুষকে সরবরাহ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবন পথে চলার জন্য কোন পথনির্দেশ দেয়া যেতে পারে না, এটি একটি সর্বজনবিদিত সত্য। আবার একথাও সত্য, মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভুতির বাইরের বস্তু-বিষয়গুলো, যেগুলো মানবিক জ্ঞানের আওতায় কখনো আসেনি এবং আসতেও পারে না, যেগুলোকে সে কখনো দেখেনি, স্পর্শ করেনি এবং যেগুলোর স্বাদও গ্রহণ করেনি, সেগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষার ভাণ্ডারে কোন শব্দও রচিত হয়নি এবং প্রত্যেক শ্রোতার মনে তাদের নির্ভুল ছবি অংকিত করার মতো কোন পরিচিত বর্ণনা পদ্ধতিও পাওয়া যায় না। কাজেই এ ধরনের বিষয় বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো প্রকৃত সত্যের সাথে নিকটতর সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভবযোগ্য জিনিসগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষায় পাওয়া যায়। এ জন্য অতি প্রাকৃতিক তথা মানবিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বের ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো বুঝাবার জন্য কুরআন মজীদে এ ধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকেই ‘মুতাশাবিহাত’ বলা হয়। কিন্তু এ ভাষা ব্যবহারের ফলে মানুষ বড় জোর সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে অথবা সত্যের অস্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী নয়। এ ধরনের আয়াতের অর্থ নির্ণয়ের ও নির্দিষ্টকরনের জন্য যত বেশী চেষ্টা করা হবে তত বেশী সংশয়-সন্দেহ ও সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের নিকটতর হবার চাইতে বরং তার থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কাজেই যারা সত্যসন্ধানী এবং আজেবাজে অর্থহীন বিষয়ের চর্চা করার মানসিকতা যাদের নেই, তারা ‘মুতাশাবিহাত’ থেকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। এতটুকুন ধারণাই তাদের কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট হয়। তারপর তারা ‘মুহ্‌কামাত’ এর পেছনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু যারা ফিত্‌নাবাজ অথবা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে অভ্যস্ত, তাদের কাজই হয় মুতাশাবিহাতের আলোচনায় মশগুল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা পেছন দিয়ে সিঁদ কাটে।

এখানে এ অমূলক সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, মুতাশাবিহাতের সঠিক অর্থ যখন তারা জানে না তখন তারা তার ওপর কেমন করে ঈমান আনে? আসলে একজন সচেতন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর দূরবর্তী অসঙ্গত বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার বিশ্বাস জন্মে না। এ বিশ্বাস জন্মে মুহকামাত আয়াতগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। মুহকামাত আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পর যখন তার মনে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা আসে তখন মুতাশাবিহাত তার মনে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংশয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাদের যতটুকু সরল অর্থ সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় ততটুকুই গ্রহণ করে নেয় আর যেখানে অর্থের জটিলতা দেখা দেয় সেখানে দূরবীণ লাগিয়ে অর্থের গভীরে প্রবেশ করার নামে উল্টা-সিধা অর্থ করার পরিবর্তে সে আল্লাহর কালামের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথাগুলোর দিকে নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়।

[১] আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মুলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার দ্বারা অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর

ব্যাখ্যা এরূপ, কুরআনুল কারীমে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে ‘মুহকামাত’ তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে ‘মুতাশাবিহাত’ তথা অস্পষ্ট আয়াত বলা হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুহকাম হচ্ছে, ঐ সব আয়াতগুলো, যা নাসেখ বা রহিতকারী, যাতে আছে হালাল-হারামের বর্ণনা, শরীআতের সীমারেখা, ফরয-ওয়াজিব, ঈমান ও আমলের বিষয়াদির বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ হচ্ছে, যা মানসূখ বা রহিত, যাতে উদাহরণ ও এ জাতীয় বিষয়াদি পেশ করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা ‘উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা হল, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখা। যে আয়াতের অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। উদাহরণতঃ ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ

(اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ)

অর্থাৎ "সে আমার নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়। ” [সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৫৯] অন্যত্র বলা হয়েছে,

(اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ)

অর্থাৎ “আল্লাহ্র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯]

এসব আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্র পুত্র-নাসারাদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তারা যদি (كَلِمَةُ اللّٰهِ) ‘আল্লাহ্র কালেমা’ বা (رُوْحٌ مِنْهُ); ‘তাঁর পক্ষ থেকে রূহ’ শব্দদ্বয় দ্বারা দলীল নেয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের বলতে হবে যে, পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকেই এশব্দদ্বয়কে বুঝতে হবে। সে আলোকে উপরোক্ত (كَلِمَةُ اللّٰهِ । رُوْحٌ مِنْهُ) শব্দদ্বয় সম্পর্কে এটাই বলতে হয় যে, ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে সৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি রূহ মাত্র।

[২] বলা হয়েছে, ‘যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে’ । ইবনে আব্বাস বলেন, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে এ কথা বলে যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ আয়াতের উপর এবং মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ইচ্ছাকৃত সন্দেহ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করে, ফলে তারা নিজেরা সন্দেহে পতিত হয় এবং পথভ্রষ্ট হয়। তারা সঠিক পথ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত দেখে বললেন, “তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিপরীতে ব্যবহার করত। আল্লাহ্‌র কুরআন তো এ জন্যই নাযিল হয়েছিল যে, এর একাংশ অপর অংশের সত্যয়ণ করবে। সুতরাং তোমরা এর একাংশকে অপর অংশের কারণে মিথ্যারোপ করো না। এর যে অংশের অর্থ তোমরা জানবে সেটা বলবে, আর যে অংশের অর্থ জানবে না সেটা আলেম বা যারা জানে তাদের কাছে সোপর্দ করো। ” [মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৫, নং ৬৭৪১; মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১১/২১৬২১৭, হাদীস নং ২৩৭০]

[৩] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ কি এ সমস্ত মুতাশাবিহাতের অর্থ জানে কি না? কোন কোন মুফাসসির এখানে (تأويل) শব্দের অর্থভেদে এর উত্তর দিয়েছেন। কারণ, (تأويل) শব্দটির এক অর্থ, তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অপর অর্থ, সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য আয়াতটি নিয়ে আসা হয়েছে। যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর কোন কোন অর্থ মুফাসসিরগণ করেছেন। যা ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। সে হিসেবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এগুলোর (تأويل) তথা ব্যাখ্যা জানে। [তাবারী]। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তখন এর অর্থ আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন যে, মুতাশাবিহাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের জ্ঞানের দৃঢ়তার পরিচয় এই যে, তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সব ধরনের আয়াতের উপরই ঈমান এনেছে, অথচ তারা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের (تأويل) তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না’ । অনুরূপভাবে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলোর (تأويل) তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না, বরং তারা বলে, আমরা এগুলোতে ঈমান আনি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে’ । [তাবারী]

[৪] এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্র। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, “যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা এ সমস্ত (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে, তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ্‌ এ সমস্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে। " [বুখারী ৪৫৪৭; মুসলিম: ২৬৬৫]

আল্লাহ তা ‘আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাতে দু’ ধরণের আয়াত রয়েছে, মুহকাম ও মুতাশাবিহ। মুহকাম ও মুতাশাবিহ এর দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আয়াতগুলো তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. اَلْمُحْكَمُ الْعَامُ

অর্থাৎ কুরআনের শব্দ ও অর্থ সব কিছু বলিষ্ঠ, মজবুত ও উৎকৃষ্ট। ভাষা অলংকারে কুরআন সবার ঊর্ধ্বে, তার সকল সংবাদ সত্য ও উপকারী। এতে মিথ্যা, অনর্থক ও কোন প্রকার বৈপরিত্য নেই। তার সকল বিধান ন্যায়সঙ্গত ও হিকমতপূর্ণ, কোনরূপ জুলুম ও অবোধগম্যতা নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ কুরআন মুহকাম। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ)

“এটা এমন গ্রন্থ যার আয়াতগুলো সুদৃঢ়, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে।” (সূরা হুদ ১১:১)

২. اَلْمُتَشَابِهُ الْعَامُ অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুরআন এক অংশ অন্য অংশের সাথে পূর্ণতা, দৃঢ়তা ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ)

“আল্লাহ অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন কিতাব যা সুসামঞ্জস্য, বার বার তেলাওয়াত করা হয়। এতে তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, অতঃপর তাদের দেহ ও তাদের অন্তর বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (সূরা যুমার ৩৯:২৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ‌ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا)

"তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অবশ্যই অনেক অসঙ্গতি পেত।" (সূরা নিসা ৪:৮২)

৩. المحكم الخاص ببعضه

এ প্রকার মুহকাম অর্থ হল আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার, কোন অস্পষ্টতা নেই। যেমন আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ)

"হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বনকারী হও।" (সূরা বাকারাহ ২:২১) এরূপ উদাহরণ অনেক।

المتشابه الخاص ببعضه

এ প্রকার মুতাশাবিহ অর্থ হল- আয়াতের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট। এ আয়াতগুলো থেকে কোন ব্যক্তি এমন কিছু ধারণা করতে পারে যা আল্লাহ তা 'আলা বা তাঁর কিতাব অথবা তাঁর রাসূলের সাথে উপযোগী নয়। যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা সেগুলোর মর্ম অনেক ক্ষেত্রে অনুধাবন করতে পারে।

আল্লাহ তা 'আলার সাথে সম্পৃক্ত, যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা 'আলার এ কথা থেকে ধারণা করতে পারে-

(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ)

"বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৬৪)

আল্লাহ তা ‘আলার দু’ হাত মানুষের হাতের মত। মূলতঃ এমন ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা ‘আলার দু’ টি হাত রয়েছে কিন্তু মানুষের হাতের মত নয়; বরং তাঁর জন্য যেমন শোভা পায় ও হওয়া উচিত তেমনই। কারণ আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ)

“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা শুরা ৪২:১১)

আল্লাহ তা ‘আলার কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সাঙঘর্ষিক ও এক আয়াত অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(مَآ اَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَکَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِکَ)

“তোমার যা কল্যাণ হয় তা আল্লাহর নিকট হতে এবং তোমার যা অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে।” (সূরা নিসা ৪:৭৯) আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

(وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ)

“যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে ‘এটা আল্লাহর নিকট হতে।’ (সূরা নিসা ৪:৭৮)

এ আয়াতদ্বয় থেকে অনেকে ধারণা করতে পারে যে, কল্যাণ আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে আসে আর অকল্যাণ মানুষের পক্ষ থেকে আসে। মূলতঃ তা নয়, বরং কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহ তা ‘আলার নির্ধারিত তাকদীর। কিন্তু কল্যাণ বান্দার প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহ। অকল্যাণ আল্লাহ তা ‘আলাই দিয়ে থাকেন কিন্তু তা বান্দার কর্মের কারণে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ)

“তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই হাতের কামাইয়ের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।” (সূরা শুরা ৪২:৩০)

রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন কেউ আল্লাহ তা ‘আলার এ কথা থেকে ধারণা করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি সন্দেহে ছিলেন।

(فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَأُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ)

“আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দেহ করে থাক তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর; (সূরা ইউনুস ১০:৯৪) মূলত নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি সন্দেহ করেননি, বরং তিনি কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ)

“বল: ‘হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ‘ইবাদত কর আমি তাদের ‘ইবাদত করি না।” (সূরা ইউনুস ১০:১০৪) অর্থাৎ তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ কর তাহলে জেনে রেখ! আমি আমার দীনের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী। এ জন্য আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং তাদের সাথে কুফরী করি এবং একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার ইবাদত করি। (শরহু মুকাদ্দামাহ ফী উসূলুত তাফসীর: ২৩৬-২৪৩ পৃ:)

محكمات মুহকামাত আয়াতগুলোই হল কুরআনের মূল বিষয়। কারণ এ আয়াতগুলো বুঝার জন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। আর

متشابهات

মুতাশাবিহাত আয়াতগুলো এ রকম নয়। অতএব যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা চায় আল্লাহ তা ‘আলার দীনকে পরিবর্তন করতে এবং মানুষকে গোমরাহ করতে, তারা এ সমস্ত আয়াত নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং বক্রতার দিকগুলো খুঁজে বের করে, যাতে তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং তাদের বাতিল কথার স্বপক্ষে এ দলীল পেশ করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

অথচ এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলাই জানেন, অন্য কেউ নয়। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা এগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা ‘আলা ব্যতীত যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারাও ঐ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানে না; বরং তারা বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে এ কথাও বলে যে, সকল কিছুই মহান আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ থেকে। সুতরাং আল্লাহ তা ‘আলা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়। আর যারা এ সমস্ত আয়াত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং তারা এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চায়।

এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

(هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ..... أُولُوا الْأَلْبَابِ)

আয়াতটি পাঠ করলেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবিহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৪৭, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৬৫)

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا)

“হে আমাদের রব! হিদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না।” এটি একটি দু ‘আ যা মু’ মিনরা আল্লাহ তা ‘আলার কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, আল্লাহ তা ‘আলা হিদায়াত দান করার পর যেন পুনরায় তাদেরকে গুমরাহ না করেন। তাদেরকে যেন হক থেকে বাতিলের দিকে আবার ফিরিয়ে না দেন। আর এর দ্বারা যেন আল্লাহ তা ‘আলা তাদের অবস্থা ও আমল আখলাককে সুন্দর ও শুদ্ধ করে দেন। তাদেরকে যেন সরল-সোজা পথে, সুদৃঢ় ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাদের অন্তর থেকে যেন বক্রতা দূর করে দেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰي دِيْنِكَ

হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (তিরমিযী হা: ২১৪০, সহীহ)

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ)

এখানে আল্লাহ তা ‘আলা সকল মানুষকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি একদিন তাদেরকে মৃত্যুর পর আবার সমবেত করবেন। তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, তাদের কাজের প্রতিদান দেবেন। প্রত্যেকে যে কাজ করবে সে তা-ই পাবে। কাউকে বিন্দু পরিমাণ কম-বেশি দেয়া হবে না। এ ওয়াদা তিনি বাস্তবায়িত করবেন এবং সকলের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন। ঐ দিনের আগমনের এবং আল্লাহ তা ‘আলার অঙ্গীকার- এর ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একদিন তা বাস্তবায়িত হবেই।

যেমন আল্লাহ তা ‘আলা অন্য সূরায় বলেন:

(اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ)

“আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা ‘বূদ নেই, তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাতের দিন একত্র করবেনই, এতে কোন সন্দেহ নেই।” (সূরা নিসা ৪:৮৭)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কুরআনে মুহকাম ও মুতাশাবিহ দু’ ধরণের আয়াতই রয়েছে। মুহকাম আয়াতের ওপর ঈমান আনা ও আমল করা উভয়টা ওয়াজিব। আর মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান আনব এবং তার বিষয়টি আল্লাহ তা ‘আলার দিকে সোপর্দ করব।

২. যারা মুতাশাবিহ আয়াত অন্বেষণের চেষ্টা চালায় তাদেরকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব; কারণ তারা বিদআতী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী।

৩. ফেতনা প্রকাশ পেলে অন্তরের বক্রতা থেকে আল্লাহ তা ‘আলার কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত।